

মুক্তমনার পাঁচ বছর
ধর্ম চেতনা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস
-- ওয়াহিদ রেজা --

(ডাঃ ওয়াহিদ রেজা বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের ব্যক্তিগত অনুমতি নিয়ে “দুইবাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম ; সম্পাদনা প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩; প্রকাশ :জানুয়ারি ২০০২” গ্রন্থ থেকে অনুলিখিত।লেখাটি মুক্তমনার জন্য অনুলিখন করেছেন [অনন্ত](#)।)

পর্ব-১

আদিম বা আদম মানব মানব গোষ্ঠীর প্রারম্ভিক যুগে পৃথিবীতে না ছিল কোনো ঈশ্বর, না ছিলো কোনো ধর্মের অস্তিত্ব। মানুষের মন থেকেই ধর্মের জন্ম, ঈশ্বর নামক অদৃশ্য অলীক ব্যক্তিত্বের গর্ভপাত। তারপরও মানুষ তার অ-মানুষ স্তর থেকে মানুষের অবস্থায় বিবর্তিত হওয়ার কালে কেন বা কি করে ধার্মিক হয়ে উঠলো এবং আজ পর্যন্তই বা কেন ধর্মবিশ্বাসকে আগলে রেখেছে, কোন নিয়মে বা কোন প্রয়োজনে মানুষ তার আদিম জীবনের স্থূল ধর্মীয় ধারণাকে পরবর্তী যুগে উচ্চতর মার্জিত রূপ দান করেছে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তরটিতে যে কথাগুলো উঠে আসে, তা হলো সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার ও ধর্মীয় চেতনার ধোঁয়ার অস্পষ্টতায় ক্ষমতার লিপ্সা। অর্থাৎ প্রভুত্ব। ধর্মীয় মৌলবাদের রাজত্ব। অরাজকতা। মানবতার অবমূল্যায়ন। মানুষের স্বাধিকার হরণের একচ্ছত্র শোষণ।

আজ ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। সব ধর্মেরই প্রাতিষ্ঠানিকতার পবিত্র (!) হাতে লেগে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগ। ধর্ম তার এই তথাকথিত অগ্রগতির সঙ্গে নিজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য অতীন্দ্রিয় সত্তার সমর্থন ব্যতীত ধর্ম স্বপ্নের অর্থহীন শিল্পকলায় বা একটি সুন্দর মায়ায় পর্যবসিত হয়। বিস্তৃত বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে রয়েছে ধর্মবোধের চিরবৈরিতা। আজ বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমউৎকর্ষকালে মানুষের মৌলিক মেধা, মনন ও জ্ঞান চর্চা যখন প্রতি পদে পদে সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধত্বের কালো পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্বমানবতার সার্বজনীন উষার আলোমুখি ধাবমান তখন ধর্মের অন্তঃসার শূণ্যতা ও ধর্মবোধের অযথার্থতা যে আগামী একদিন প্রমাণিত হবেই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তখন ধ্বংস হয়ে যাবে ধর্মের ভীতিকর অলীক ঈশ্বরতত্ত্ব। ধুলায় মিলিয়ে যাবে ধর্মীয় লোভ ও বিভীষিকার তথাকথিত স্বর্গ-নরকের পরলৌকিক বাগাড়ম্বর।

মানুষের জ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক স্তরটি ছিল ভয়, সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্বের অধ্যায়। প্রাকৃতিক বিবর্তন, আলোড়ন, দুর্যোগ ইত্যাদি এ সবার মূল কারণ। তৎকালীন সময় অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ সমস্ত প্রাকৃতিক কার্যবিধির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-হীনতারই একমাত্র কারণ, অবলম্বন বা ধারণাই মানব মস্তিষ্কে বাধ্য করেছে অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক নামক ভূয়া সংশয়ের কাছে আত্মসমর্পণে। যার ধারাবাহিক অনিবার্য

ফলশ্রুতি হলো ধর্মচেতনা। আর এই ধর্মচেতনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী উন্নত মানুষের মৌলিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পুরাকালে এই মতের সমর্থক ছিলেন এপিকিউরীয় (Epicurean) দার্শনিকগণ এবং ল্যাটিন কবি লুক্রেটিয়াস (Lucretius)। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কারের যমজভাই বিবেচনা করতেন। পেট্রোনিয়াসের (Petronius) বিখ্যাত একটি পংক্তিতে এই মতের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। **Primus in orbe deos facit timor** (প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ভয় থেকে এসেছে)। আধুনিককালে হিউম (Hume) ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উৎস হিসেবে ভয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি আরো একটি কথা যোগ করে দিয়েছেন- ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তাঁর সদিচ্ছা লাভের রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিককালে অনেক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, যেমন রিবট (Reibot) এই ‘ভীতির মতবাদ’কে সমর্থন করেন। আদিম অবস্থায় ধর্মে ভয়ের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মচেতনা। ধর্মীয় মনোভাব হলো অধিকতর শক্তিশালী কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ। একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তিকে একজন ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করে। আর সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটিই হলেন ঈশ্বর বা আল্লাহ। এটি অবশ্য উন্নত ধর্মচেতনার আধুনিক পরিণতি। প্রাথমিক স্তরে আদি টোটেম ছিলো তার প্রতীক। রবার্টসন স্মিথ (W. Robertson Smith) এই মত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তাঁর বহু পরিচিত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত হলো, ‘*আদিম মানুষেরা অসংখ্য বিপদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে করতো, সঠিকভাবে তারা বিপদটা কি জানতো না; কিন্তু অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির রহস্যময় শক্তিই যে বিপদের (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কারণ এমন একটা উপলব্ধি বা ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করে। এবং এই উপলব্ধি থেকে তারা বুঝতে শেখে যে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি মানুষের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী*’ (W. R. Smith, *The Religion of Semites*, P. 55) মূলত এই প্রাচীন উপলব্ধি বা ধারণা থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মচেতনার আদি অঙ্কুরের বিকাশ। ধর্মবোধের আদি অবস্থা থেকে আধুনিক ধর্মচেতনা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ভূমিকা যে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত হলো বাইবেল ও কোরান। ওল্ড টেস্টামেন্টের জনপ্রিয় নীতি হচ্ছে, ‘*প্রভুর প্রতি ভয়ই হলো জ্ঞানলাভের সূচনা*’ (eg Ps. exi.10. Prov. ix. 10) এবং নিউটেস্টামেন্টে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে, ‘*ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে উপাসনা করো কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করো*’ (Heb. xxii-28, Moffe-এর অনুবাদ)। ভয় + শ্রদ্ধা? না মনোবিজ্ঞান আজ এ কথাটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভয় থেকে কখনো প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে পারে না। তবে বাইবেলের চেয়ে কোরান ভয় প্রদর্শনে অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও শাণিত। কোরানের আল্লাহ চক্ষু রাঙিয়ে পাতায় পাতায় ভয়-ভীতির তর্জনী উঁচিয়ে রেখেছেন মানুষের প্রতি! তিনি একদিকে নিজেকে পরম দয়ালু ও অন্যদিকে চরম নিষ্ঠুর দাবি করেন। কিন্তু প্রকৃত দয়ালু যে কখনো নিষ্ঠুর হতে পারেন না এর বিশদ ব্যাখ্যার কী কোনো প্রয়োজন আছে?

ধর্মচেতনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের চেয়ে অন্ধ আবেগ, অনুভূতির সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠতর এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এর পেছনের মূল ভিত্তিটি হলো- বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হচ্ছে প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন, বুদ্ধিবিবেচনাহীন একটি বিষয়। জগৎ যেভাবে দৃশ্যমান ঠিক সেই ভাবে ধর্মীয় চেতনা জগতকে গ্রহণ করে না। ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অফুরন্ত, অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি ধর্মের যতোটা আস্থা রয়েছে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ততোটা নেই (এটা প্রমাণ করতে বেশি দূর দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই, আজকের ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কথাবার্তা, কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে)। ধর্ম বিশ্বাস করতে শেখায় সেই অতীন্দ্রিয় আর্থিক জগৎ যা মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ। এটা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই জগতে বিচরণ করছে অধিকাংশ মানুষ। এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পুঁজি করেই

ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারগণ যুগ যুগ ধরে মানুষকে ধর্মচেতনার আজগুবি অতীন্দ্রিয় জগতের লোভ প্রদর্শন করে বিপথগামী করেছে, অর্থাৎ মানুষের মৌলিক বিকাশ ও মানবতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছে, কল্পনাপ্রবণ এই সব চিন্তাবিদদের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ আরোহমূলক ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে অকারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভন্ডামি বলা যেতে পারে। প্লেটোর সম্পর্কে জুবর্ট যেমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুকরণে ম্যাথু আর্নল্ড শেলির সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে যে, ‘এক মুন্দের কিন্তু নিষ্ফল দেবদূত। যে তার দ্যুতিময় পাখা মহাশূন্যে বৃথাই আন্দোলন করেছিলো’। বাক্যটি একটু ওলট পালট করে আমরা কল্পনাপ্রবণ ধর্মীয় ভাববাদী ও পান্ডাদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করতে পারি। তারাও তাদের পাখা (ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই) মেলে দিয়েছিলেন কল্পনারাজ্যের মহাশূন্যে। সেখানে কোনো বায়ুমন্ডল নেই। যদিও থাকে তা এতোই লঘু যে কেউ তাতে পাখা উড়ে যেতে পারে না। এই কল্পনার সঙ্গে ঐতিহাসিক রুঢ় বাস্তবের কোনো মিল নেই।

কোঁতে (Comte) তাঁর ‘Religion of Humanity’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘ধর্ম হলো মানুষের মস্তিষ্ক প্রমুখ একটি কৃত্রিম সৃষ্টি’। কিন্তু এই কৃত্রিমতা যে ক্রমান্বয়ে মানুষের মেধায় ও মননে বায়বীয় এক অকৃত্রিমতার রূপ লাভ করেছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। ধর্ম তাই এক ধরনের অতীন্দ্রিয় বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রতিটি ধার্মিকের কাছে। আর ধার্মিক মাত্রই বিশ্বাসী। আর বিশ্বাস মাত্রই প্রশ্ন-যুক্তি-আকাংক্ষাহীন বিষয়। বিজ্ঞান বুদ্ধিভিত্তিক। বিজ্ঞান প্রশ্ন-যুক্তি-কৌতহল-আকাংক্ষার সমন্বয়। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। প্রশ্ন-যুক্তি নিষিদ্ধ। ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ধর্ম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসী। সে অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এবং বুদ্ধিনিরপেক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ধর্ম পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। এর কোনোটিই বিজ্ঞানের কাজ নয়। এর কোনোটিই বিজ্ঞান সমর্থন করে না। তাই ধর্মকে এখন অবশ্যই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

‘মানুষের ইতিহাস হলো প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ইতিহাস’। মানব সভ্যতার মূলের দিক থেকে বিচার করলে ম্যাক্সমুলারের (Max Muller) এই উক্তিতে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। কারণ এমন কোনো আদিম মানব গোষ্ঠী বা সমাজ ছিলো না যেখানে অজ্ঞতা থেকে ধর্মের ধারণা প্রথম সৃষ্টি লাভ করে নি। অবশ্য আজকের সুসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গে আদিম ধর্মমতের পার্থক্য ছিলো অনেক। ধর্মের প্রথম উৎপত্তিও ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আর তারপরই ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের একটি সীমিত রচনায় তার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। এখানে কেবল মানুষের প্রাচীন ধর্মবোধ থেকে বর্তমান ধর্মবোধের উন্নত অবস্থা লাভের একটি সংক্ষিপ্তসার টানা যেতে পারে যা কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয়।

‘ধর্ম একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। একে কোনো একটি মাত্র সামাজিক রীতির বৃদ্ধি বা বিসৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। যতাই আদিম রূপের হোক না কেন কোনো ঈদামনা কোনো একটি মাত্র চিন্তার বা একটি মাত্র আবেগের প্রকাশ বলা যায় না। বরং ধর্ম হলো (মানব সভ্যতার ক্রম

বিবর্তনশীল ধারার বহু বহু পূর্বের) অনেকগুলো জটিল ও শক্তিশালী
চিন্তার সৃষ্টি’ (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)।

মানুষের মনেই ধর্মের জন্ম। জ্ঞানের উষালগ্নে মানুষের জীবনের উপর ব্যাখ্যাহীন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই শক্তির অস্তিত্ব অনুমানের ফলে মানুষের মনে যে আবেগ জন্মেছিলো তার থেকেই ধর্মচেতনার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের মতো আজকের স্বঘোষিত উন্নত ধর্মগুলোও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুষের বিশ্বাসের প্রশ্নে অলীক জগতের হাতছানি দেয়; ঈশ্বর, দেব দেবী, জীন, ফেরেশতা, স্বর্গ, নরকের গল্পো শোনায়ে, আত্মা অমরত্বের লোভ দেখিয়ে উর্বর মানব মস্তিষ্কের বিকলাঙ্গতা ঘটায়। সালোমন রেইনখ (Salomon Reinach) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘আমি এইভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চাই- আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে’ (Salomon Reinach Orepheus [E. Tr. 109] p.3)। এ কথা অনস্বীকার্য যে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপন্থী। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম উভয়ই প্রগতির পরিপন্থী। তারপরও এদুটি ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আজ এতোটা স্ফীত কেন? এর জবাব খুঁজতে যাবার আগে ধর্মের ইতিহাস একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস এরকম অনুমান করা থেকে বিরত থাকতে হবে, পরিবর্তে শোষণ, প্রভুত্ব, ক্ষমতালোলুপতার ধারাবাহিক ইতিহাসের কথাটি মাথায় রাখতে হবে। কারণ অনেক পুনরাবৃত্তি, অবক্ষয়, অসম্মতা ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তনের কাহিনী রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। যুগে যুগে প্রগতি যখন এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অন্যত্র তখন সে পরিবর্তনের পথে বিকশিত হয়ে নতুন পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে চিহ্নিত ধর্মের আদিম যুগের ফেটিশবাদ (Fetishism) কোনোভাবেই প্রগতি নয়। এটা প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাৎগতির নিদর্শন। **Fetish** কথাটি এসেছে পর্তুগীজ **Feitico** শব্দ থেকে। **Feitico** শব্দের অর্থ হলো মুগ্ধ হওয়া বা বিস্মিত হওয়া। আবার **Feitico** শব্দ এসেছে ল্যাটিন **Factitius** শব্দ থেকে। **Factitius** শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম। অবশ্য মধ্যযুগে ল্যাটিন এই শব্দটির অর্থ ছিলো - ঐন্দ্রজালিক। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের উপাস্য-বস্তুকে উল্লেখ করার জন্য পঞ্চদশ শতকের পর্তুগীজ নাবিকেরা এই শব্দটি ব্যবহার করতো। ফেটিশ একটি জড় পদার্থ। আত্মা বা রহস্যময় শক্তির এটি আবাসস্থল। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই বস্তুটির উপর আত্মা ভর করে বলে বিশ্বাস করা হতো। সেই জন্য জড় বস্তুটিকে উপাসনা করা হতো এবং সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা হতো। প্রাকৃতিক বস্তু হিশেবে ফেটিশের নিজস্ব কোনো মূল্য ছিলো না। যে আত্মা তাতে বসবাস করে বা এসে অবস্থান করে সেই আত্মার গুণে মূল্যায়ন হতো ফেটিশের। হয়তো কোনো অদ্ভুত-দর্শন প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন অস্বাভাবিক একটা পাথর কিংবা লাঠি, অথবা হাড় বা নখ প্রথম মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করতো। তারা ভাবতো হয়তো এখানে অপার্থিব কোনো শক্তি থাকতে পারে। এই ভাবনা থেকে তারা উপাসনা করতে শুরু করে।

ফেটিশের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হতো। কিন্তু যদি দেখা যেতো তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আকাংখিত বস্তুটি চাওয়া হতো। তাতেও না পাওয়া গেলে আদেশ করা হতো। কিন্তু তারপরও যদি আকাংখিত বস্তুটি পাওয়া না যেতো তখন শুরু হতো গালাগালি। এমন কি চাবুকও মারা হতো ফেটিশকে। কিন্তু যদি তাও ব্যর্থ হতো তখন ধরে নেয়া হতো জিনিসটিকে ছেড়ে আত্মা চলে গেছে। প্রয়োগবাদের আদিমতম রূপটি সম্ভবত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটি ফেটিশ থেকে যতক্ষণ কাজ পাওয়া যায় ততক্ষণ সে পবিত্র। নইলে দাও আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে। অবশ্য এর ফলে ফেটিশকদের সমাপ্তি ঘটছে না। একটা ফেটিশ গেলে নতুন আরেকটা বস্তুকে ফেটিশ হিশেবে গ্রহণ করা হতো। স্পষ্টতঃ ফেটিশবাদ

অত্যন্ত অনুন্নত মানের ধর্ম। ফেটিশ একটি ব্যক্তিগত দেবতা। অসভ্যরা নিজেদের নির্দেশে তাকে কাজ করতে বাধ্য করতো। এই ধারণা ব্যক্তিগত এবং খামখেয়ালী চিন্তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এবার আরো একটি ধর্মীয় মানের অধোগতির বিষয় বলা যেতে পারে। ফেটিশবাদের মতো বহু আত্মা উপাসনাবাদও (Polydoemonism) ধর্মীয় মানের আধোগতির নিদর্শন। সমগ্র চরাচর অসংখ্য আত্মায় পরিব্যাপ্ত। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সুবিধা বা অসুবিধার জন্য তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। স্বপ্ন থেকে যে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আদিম মানুষের কাছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই বাস্তব ছিলো। তারা আত্মাকে নিজেদের অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট প্রতিকূপ বলে ভাবতো। ঘুমের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় আবার জেগে উঠার আগে দেহে ফিরে আসে- এই ভাবে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতো। স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হলো স্বপ্নে আত্মা ফিরে আসে কিন্তু মৃত্যু হলে আত্মা আর দেহে ফিরে আসে না অথবা বলা যেতে পারে আত্মা দেহে না ফিরে এলে মৃত্যু হয়। আদিম মানুষ নিজেদের আত্মার মতো তার চারপাশের জীব ও জড় সব কিছুর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করতো।

ফেটিশ শ্রেণীকে বাদ দিয়ে জগতের এই অসংখ্য আত্মাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত- নদী, পর্বত, সমুদ্র, গাছ, পাথর, পাখি, সাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের আত্মার কল্পনা। এসবের নির্বাচিত আত্মাগুলোকে আদিম মানুষেরা নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী মনে করতো। অন্তত এদের অনিস্ট করার ক্ষমতা যে বেশি সেটা তারা বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা হলো মৃত মানুষের আত্মা। মৃত্যুর পর আত্মা বেঁচে থাকে এরকম এরকম অলীক ধারণা যে অসভ্য মানুষদের মধ্যে ছিলো (আজও অনেকের মধ্যেই আছে) তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ফলে আত্মার ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বলে তারা বিশ্বাস করতো। পূর্বপুরুষদের উপাসনা সকল অসভ্য সমাজে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে বিশাল প্রাকৃতিক (সৌর কেন্দ্রিক) বস্তুগুলোর আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ। যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি একসময় মানুষের উপাস্য হয়ে উঠেছিলো। মানুষের ধারণা যখন কিছুটা উন্নত হয়েছিলো তখন তাদের মনযোগ গেলো এই বিশাল প্রাকৃতিক জিনিসগুলো সম্পর্কে। এন্ড্রু ল্যাঙ্গে (Andrew Lange) তাঁর Making of Religion গ্রন্থে বলেছেন,

‘সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসভ্য মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করলেও তারা মংজ্ঞার সাহায্যে একজন পিতার বা অব্যকিছুর স্রষ্টার কল্পনা করতো। তিনি আদি। অন্যান্য মাধার্য আত্মা অপেক্ষা তাঁর স্থান উর্ধ্বে। সেই আত্মার এতদূর পর্যন্ত বদেছেন যে, অসভ্যদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মতোই একেশ্বরবাদী ছিলো। তাদেরও একজন পরমেশ্বর ছিলেন’ (Andrew Lange ; The Making of Religion, P. 167)।

একথা হয়তো সত্য যে সমস্ত কিছুর অস্পষ্ট পশ্চাৎপটে একজন পরমেশ্বরের ধারণা অসভ্যদের মধ্যে একেবারে অপরিচিত ছিলো না। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানুষ অনুভব করতো যে শত্রুভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মার দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের বাঁচতে হয়। তাই তারা সেই আত্মাদের সমুপস্থিত করার চেষ্টা

করতো। আত্মার সংখ্যা যতো বেড়ে যেতো তাদের সম্পর্কে ভয়ও ততো বাড়তো। এভাবেই ধর্মে ভয়ের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। অসভ্য মানুষের ধর্মে ভয়ই প্রধান এবং ক্রটি অসংখ্য।

এদের এই সব অজস্র ক্রটি এবং স্কুলতা, ছেলেমানুষী এবং অজ্ঞতা থাকার পরও বলা যায় সভ্য মানুষের আত্মার ধারণা অসভ্যদের আত্মার ধারণারই সংস্কৃত রূপ। টাইলর (E. B. Tylor) তাঁর **Primitive Culture** গ্রন্থের প্রথম খন্ড শেষ করেছেন এই কথা বলে

‘আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ (অবদ্বানবাদ) ধর্মের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশ। বর্বরদের ফ্রেটিশ উপাসনা এবং মুন্ড্য খ্রীষ্টানদের উপাসনার মধ্যে মানসিক সংযোগের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাটি রয়েছে তা এই মতবাদের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। যে বিভেদ বিশ্বের সকল বৃহৎ ধর্মমতাদ্বলোকে দৃশ্য করে রেখেছে সেই ধর্মীয় মাম্পদায়িকতার সুগভীর পার্থক্যের তুলনায় অবদ্বানবাদ এবং জড়বাদের পার্থক্য অনেক বাস্তবিক।’

গোষ্ঠীর রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। মূলত টোটেমবাদ থেকে এর ধারাবাহিকতা শুরু গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য থেকে যেমন প্রশ্রয় পেয়েছে রক্ষণশীলতা, তেমনি আত্মিক বিশ্বাসের একটি পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় কোনো সাধারণ শত্রুর ভয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হতো। আবার কখনো কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলোকে জয় করে একটি বৃহৎ জনসমষ্টিতে পরিণত হতো। তার ফলে মানুষের মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি ঘটে এবং তার জীবনবোধ হয় গভীরতর। সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায়ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সময় থেকেই বহু আত্মবাদ বহু ঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়। আগে যে বহু আত্মা উপাসনা হতো সেই আত্মাগুলোকে কোনোমতে দেবতা বলা যায় না। তাদের কোনো ইতিহাস ছিলো না, ব্যক্তিগত চরিত্র ছিলো না, এমন কি একটা নামও ছিলো না। প্রাকৃতিক সেই আত্মাগুলোই ক্রমশ আধুনিকরণে মনুষ্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলো। কল্পনা করা হলো, মানুষের মতো তাঁদেরও ভালোলাগা মন্দলাগা রয়েছে, আবেগ উচ্ছ্বাস আছে, তাঁদের আহ্বান করা যায়, এবং তাঁদের একটি নামও রয়েছে। এর অর্থ এই ধরা যাবে না যে, এরপর নদী, গাছ, আগুন, মেঘ, আকাশ প্রভৃতিতে যে সব আত্মা বসবাস করতো তাদের ধারণা শেষ হয়ে গেলো। বরং পূর্বে যে সব স্বর্গীয় দেবতাদের পূজো করা হতো না তারাই এসে আত্মার স্থান দখল করে বসলো। প্রকৃত ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম। নতুন কোনো স্বর্গীয় ঈশ্বর তখনো হাজির হয়নি। তাঁর উপস্থিতির আগেই ওইসব প্রাকৃতিক আত্মাগুলো ক্রমশ দেবত্বের মর্যাদা পেতে থাকে। কল্পনা শুরু হয় দেবতারা স্বর্গবাসী। তারপরও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদিম সম্পর্কটি একেবারে মুছে গেলো না। অবশ্য ধীরে ধীরে দেবতার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কমে আসতে লাগলো। দেবতারা ক্রমশ নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তারা একেকজন প্রধান হয়ে উঠলেন রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে। যেমন যুদ্ধের দেবতা, ভালোবাসার দেবতা, কৃষি, শিল্প ও সৌভাগ্যের, বড়-ঝড়ের আলাদা আলাদা করে দেবতা কল্পিত হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক ‘অগ্নি’ আগুনের দেবতা, পারস্যের ‘আহুরা’ আলোর দেবতা, ব্যাবিলনের ‘মার্দুক’ এবং মিশরের ‘রা’ হলেন সূর্যদেবতা, গ্রীসের ‘জিউস’ এবং ল্যাটিন ‘জুপিটার’ স্বর্গের দেবতা, জার্মানের ‘ওডিন’ এবং বৈদিক ‘ইন্দ্র’ ঝড়ের দেবতা। এই সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক

বুনিয়াদের উপর আশ্রয় করে ধর্মীয় কল্পনার জাল বুনে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক আত্মায় মানবত্ব আরোপ করার ফলেই যে সকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণা ঠিক নয়। মানুষের ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্য থেকে এবং উৎসর্গ ও প্রার্থনার দ্বারাও অনেক দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় দেবতার মধ্যে আছেন, যেমন ভারতীয় ব্রহ্ম, মিশরের ওশিরিস, গ্রীসের অ্যাপোলো, ল্যাটিন মার্স, বৈদিক বরুণ ও বিষ্ণু, হিব্রু জিহোভা প্রভৃতি। একবার যখন এঁদের ব্যক্তিগত গুণ আরোপ করা হলো তখনই তাঁদের মরজগতের উর্ধ্বে, একটা অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক আত্মিক জগতে স্থাপন করার মানসিক প্রবণতা দেখা দিলো। সেই জগতে দেব-দেবীদের নিয়ে একটি সমাজ কল্পনা করা হলো। **আসলে ধর্ম বুদ্ধিধর্মী হওয়ার আগে থেকেই কল্পনা ও আবেগ প্রধান। ধর্ম হলো একরকমের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছার সংমিশ্রণ। যথেষ্ট কল্পনা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ।**

জাতীয়ভাবে ধর্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গতিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি দেবতাদের উপর নৈতিক গুণ আরোপ অন্যটি একেশ্বরবাদ অভিমুখি যাত্রা। দেবতাদের উপর নৈতিক গুণারোপের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মা সম্পর্কিত ব্যাপারটি বাদ দিতে হবে। কারণ এর কোনো নৈতিক আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুর আওতা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে মোটামুটি একটি অতীন্দ্রিয় জগতে স্থাপিত হলো এবং আত্মাকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হলো, অন্তত আত্মাকে মনুষ্যগুণসম্পন্ন বলে মনে করা হলো, আর তখনই প্রশস্ত হয়ে গেলো দেবতাদের মঙ্গলময় ও ন্যায়বান বলে ধারণা করার পথ। এরপর ক্রমশ দেবতারা মানুষের আদর্শ এবং নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠলেন। ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো তিনি সৎকে পুরস্কৃত করেন এবং অসৎকে শাস্তি দেন। তারপর থেকে দেবতাদের নৈতিক জগতের ধারক ও বাহকরূপে কল্পনা করা হতে থাকে। হফডিং (Hoffding) বলেছেন,

‘প্রাকৃত ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উদ্ভবরূপে ধর্মের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে যে গণ্য করা হয়তো তা যথার্থ। বহু ঈশ্বরবাদী ধারণার একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত হওয়ার দ্বিটন্য অপেক্ষা এই পরিবর্তন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ’ (H. Hoffding, The Philosophy of Religion, 1906, p. 326)।

এভাবে দেবতাদের নৈতিক গুণারোপ করার কালে এক একজন দেবতা এক একটি গুণের প্রতীক হয়ে উঠেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনীতেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন - ইন্দ্র (বেদ), মার্স (ল্যাটিন), থব (টিউটানিক) প্রভৃতি দেবতারা হয়ে উঠলেন বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রতীক বরুণ (বেদ) ও ওশিরিস (মিশরীয়) হলেন ন্যায় বিচারের দেবতা। পল্লস এ্যাথেনী (গ্রীক) প্রজ্ঞা দেবী, হেসিটা (গ্রীক) সত্য ও গাহস্থ্য আদর্শের দেবী, জরথুষ্ট্র ধর্মের প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা হলেন অমঙ্গলের শত্রু এবং বিশ্বে নৈতিকতার পরিচালক। খ্রীষ্টপূর্ব ধর্মে ওল্ড টেস্টামেন্টেই দেবতাদের সম্পর্কে নৈতিক ধারণা সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিলো।

একেশ্বরবাদে অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতীয় ধর্মে কালক্রমে অনেক দেবতার মধ্যে কোনো একটি দেবতাকে বেশি করে প্রশংসা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের সামাজিক জীবনের উপমার সাহায্যে

দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হতো। পৃথিবীর সমাজে একজন রাজা থাকেন, অতএব দেবতাদের সমাজে একজন রাজা থাকা স্বাভাবিক। এরপর আর অন্য দেবতাদের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকা সম্ভব হয় না। স্বর্গে একজন প্রধান দেবতার নেতৃত্বে অন্যান্য দেবতাদের প্রাধান্য অনুসারে ক্রমপর্যায়ে সাজানো হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রীকের লোকেরা বিশ্বাস করতো- দেবতাদের এবং সকল মানুষের পিতা হলেন জিউস। রোমানদের মতে জুপিটার হলেন প্রধান। ব্যাবিলনে মাদুর্ক, আসিরিয়ায় অসুর এবং প্রাচীন চীনধর্মে তায়েন (স্বর্গ) এবং সাংতি (দেবতাদের প্রধান) কে প্রধান বলে মনে করা হতো। পৃথিবীর সব জায়গায়, সকল জাতীয় ধর্মে দেবতাদের একটি রাজ্য কল্পনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের বিশ্বাসকে দেবতাদের রাজতন্ত্রবাদ (**Monarchianism**) বলা যেতে পারে। ম্যাক্সমুলার যাকে একদেব প্রাধান্যবাদ (**Henothedism**) বলেছেন তার মধ্যেও এই এক দেবতার প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অন্য আরো একভাবে বহুর ধারণা ‘এক’ বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। চিন্তনের সহায়তায় সকল দেবতাকে এক ঈশ্বরের বহুরূপে প্রকাশ বলে সিদ্ধান্ত করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেও একেশ্বরের ধারণা যে লাভ করা সম্ভব তার প্রমাণ প্রাচীন মিশর। প্রাচীন মিশরে সূর্যদেবতাকে সকল দেবতার আত্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন - ‘আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা, আমিই সকল দেবতার প্রাণ আমিই সকালের চেপেরা (**chepera**), দুপুরের রা (**Ra**) এবং সন্ধ্যার তমু (**Tmu**)।’ ভারতেও অনেক বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে এই প্রবণতা নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে বহু পরিচিত মন্ত্রটি হলো, ‘ওগো অগ্নি, তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন বরুণ, যখন নিহত হও তখন মিত্র, তুমিই সকল দেবতা।’ তিনি এক। মুনিরাই তাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে উপনিষদের কালে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মা বা পরমসত্তা এক। পার্থিব জগতের এই বহুত্বের ধারণা ভ্রমজ্ঞান বা মায়া। বহুর মধ্য দিয়ে ‘এক’ নিজেকে প্রকাশ করেছে। বহু দেবতার ধারণা ও অন্যান্য সব কিছুর মতো এক সত্তার ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই একেশ্বরবাদ ব্যবহারিক প্রয়োজনে বহু ঈশ্বরের উপাসনা স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীসে এই প্রবণতার বিকাশ হয়েছিলো প্রধানত : জেনোফেনিস (**Zenophanes**), পারমেনিডিস (**Permanides**) এবং স্টয়িক (**Stoics**) দার্শনিকদের প্রভাবে। গ্রীসে মানবরূপী বহু ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনোফেনিস এক পরম ঐক্যের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়জ কল্পনার দ্বারা সেই ‘এক’ কে কখনো জানা সম্ভব নয়। সর্বেশ্বরবাদীদের মতো স্টয়িক দার্শনিকগণও ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হিসেবে এবং বিশ্বচরাচরে অন্তর্বর্তী কারণ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন।

ধর্মের একেশ্বরবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল ইস্রায়েলে। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে অতি অল্প সংখ্যক ভাববাদীর অন্তর্দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদী ধারণা কখনো কখনো পেয়েছে, কিন্তু কখনোই এটি জনগণের ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। পারস্যের জরথুষ্ট্র (**Zarathustra**) একেশ্বরবাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সব দেবতাদের নির্বাসিত করেছিলেন, জেন্দ আভেস্টায় (**Zend Avesta**) তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই সব দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইস্রায়েলের সূচনায়ও প্রকৃত অর্থে একেশ্বরবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেখানে জাতীয় জীবনের সূচনায় কেবল শিক্ষক এবং নেতারা ই জিহোভা (**Yehovah**)-কে একমাত্র দেবতা বলে স্বীকার করতেন কিন্তু অন্যান্য জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্বকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। যেমন মোয়াবাইট (**Moabites**) জাতির দেবতা ছিলেন ক্যামোস (**Chammosh**), অ্যামোনাইট (**Ammonites**)-দের দেবতার নাম ছিলো মোলক (**Moloch**), জিদোনীয় (**Zidonians**)-দের দেবতা ছিলেন বাল (**Baal**)। তথাপি জিহোভাই

ছিলেন প্রধান বা একমাত্র দেবতা, যে দেবতাকে ইস্রায়েলের মানুষ উপাসনা করতো। জিহোভা ছিলেন তাদের একমাত্র ধর্মীয় আকর্ষণ। ধর্মীয় যা কিছু অভিজ্ঞতা বা যা কিছু আদর্শ তারা লাভ করতো, সব কিছুই পেতো জিহোভার কাছ থেকে। অন্য দেবতাদের উপাসনা রাজদ্রোহ হিসেবে গণ্য হতো। তার মানে এই নয় যে, সমস্ত লোক অন্য দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো। কিন্তু তারপরও তাদের কাছে জিহোভাই ছিলেন ইস্রায়েলের একমাত্র দেবতা। একে ঠিক একেশ্বরবাদ বলা যায় না। বরং একে দেবতা উপাসনা বলা যেতে পারে। অ্যামোসের (**Amos**) সময় থেকে ইস্রায়েলের জননায়কদের মধ্যে উপলব্ধি হতে শুরু করে যে জিহোভার ঐশ্বরিক এবং নৈতিক রাজত্ব এতোদূর বিস্তৃত যে, তাঁকে কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। তাঁর রাজত্ব রয়েছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। অন্য কোনো দেবতাদের স্থান আর সেখানে নেই। এই জিহোভারই পরিবর্তিতরূপ ইসলামের আল্লাহ।

হঠাৎ করে ধর্মের বিশ্বজনীনতা প্রাপ্তি ঘটে নি। এর পেছনে ছিলো যথেষ্ট প্রস্তুতি। কিছু কিছু জাতীয় ধর্মে তৎকালীন সময় এই ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। গ্রীস ও রোমান জগতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে রহস্যময় ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিলো তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার লক্ষণ ছিলো সুস্পষ্ট। ইস্রায়েলে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভাববাদীগণ বিশ্বজনীন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। রোমান এবং গ্রীসে জাতীয় দেবতাদের উপাসনা করা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। ইস্রায়েলে এ্যামোস, ইশা (**Isaiah**) এবং দ্বিতীয় ইশার শিক্ষায় জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরের বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছিলো। জেরোমিয়া (**Jeremiah**) যখন ঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ‘নতুন ধর্মশালা’ গড়ে তুলতে বলছেন, তখনই ধর্মের ইতিহাসে ‘আদর্শের বৃহত্তম এবং নবতম মূল্যায়ন’ হয়েছিলো বলা যায়। ‘আমি আমার আইন তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো, এবং তা তাদের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে দেবো’ (**Jer. xxxi 31-34**)।

ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক যদি আন্তরিকতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যারাই সেই শর্ত পালন করবে তাকে স্ফুল্লতার জন্য ধর্মের দুয়ার থাকবে উন্মুক্ত। জেরোমিয়া অবশ্য ঠিক এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। কারণ তখনো তাঁর চিন্তা ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তবে তাঁর ‘নতুন ধর্মশালা’র ধারণার মধ্যে এরকম সিদ্ধান্তের একটি প্রচ্ছন্নতা ছিলো। একই সঙ্গে ইস্রায়েলে আরো একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, জিহোভা কেবল ইস্রায়েলের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর। এই বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। তিনি সমগ্র ইস্রায়েলের মানুষের যেমন বিচার করবেন তেমনি আরব, মিশর, ব্যাবিলনের মানুষেরও বিচার করবেন। পরবর্তীকালে ইহুদীরা ধর্মীয় এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করায় জুডাবাদ ক্রমশ একটি সংকীর্ণ বিশেষ মতবাদে প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে ইস্রায়েলের ধর্ম বিশ্বজনীন খ্রীষ্টধর্মের বুনয়াদ গড়ে দিলেও নিজে জাতীয় ধর্ম থেকে যায়। তবে একথা সত্যি যে, সমস্ত শ্রেণী ও জাতির বাধা ভেঙে সকল মানুষকে পরিদ্রাণের প্রথম পথ দেখিয়েছিলো বৌদ্ধধর্ম। যেমন খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো জুডাবাদ থেকে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সংস্কার সাধন করে উৎপত্তি হয়েছিলো বৌদ্ধ ধর্মের। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর ধর্ম। এই ধর্মে আছে অত্যন্ত শ্রমসিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃচ্ছতাসাধন এবং সর্বেশ্বরবাদী দূর কল্পনা।

বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই ধর্মে পাপ থেকে পরিদ্রাণের কথা চিন্তা করা হয় নি। দুঃখ কষ্টের হাত থেকে পরিদ্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে মাত্র। যখন সকল আবেগ ও আকাংক্ষা, এমন কি বাঁচার আকাংক্ষাও লোপ পাবে, তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হলো সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ এক শান্তির অবস্থা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মা সম্পর্কিত অনেক

ধারণাকে গৌতম বুদ্ধকে অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেন নি। তাঁর মাত্র তথাকথিত আত্মা মায়া মাত্র। মানুষ কতগুলো কামনা-বাসনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যা করে তার মধ্যে দিয়েই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে। কর্ম যোগই প্রকৃত সত্য। নীতিগতভাবে বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেবতাদের অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিলো না। মানুষকে ভবচক্র থেকে মুক্ত করার কোনো সাহায্য দেবতারা করতে পারেন না। কারণ দেবতা মানেই তথাকথিত একটি কল্পিত বিষয়। বুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন,

“মুক্তির জন্য মানুষকে নিজেরই চেষ্টা করতে হবে। কোনো দৈব সাহায্য মে পাবে না। প্রার্থনা একটি অন্তঃসার শূন্য ব্যাপার। উপাসনা নিরর্থক।”

বৌদ্ধ ধর্মকে অনেকেই ধর্ম বলে স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ এই ধর্মে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের উপাসনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ যে মতবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কালানুক্রমিকভাবে খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্ম। মূল থেকেই এ ধর্মটি পুরোপুরি মিথ্যাশ্রয়ী (অবশ্য মিথ্যার অবলম্বন ছাড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়)। একটি জারজ, অবৈধ সন্তানকে কেন্দ্র করে, সমস্ত সাধারণ ঘটনার অসাধারণ রূপায়নের নাম হচ্ছে- খ্রীষ্ট ধর্ম। সেন্ট পল এর মতো ধুরন্ধর, মিথ্যাবাদী, বজ্জাত লোকের আবির্ভাব না ঘটলে খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বজনীনতার প্রশ্ন ছিলো অবাস্তব। অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, চতুর, দুর্ধর্ষ, গুন্ডাপ্রকৃতির লোক ছিলেন পল। যীশু নিজে কোনো ধর্ম দিয়ে যায়নি, এবং সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে ক্রুশেও মৃত্যু ঘটে নি তাঁর। আজ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য। এমনকি ৪: ১৫৭ বচনে কোরানও এ কথা স্বীকার করে যে, ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হয়নি। তারপরও উক্ত ধর্মের অধিকাংশ মানুষ একথা বিশ্বাস করে আবেগাপ্ত হলে যে, যীশু সশরীরে স্বর্গে চলে গেছেন এবং অদ্যাবধি তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছেন এবং বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্তির সময়, অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে আবার তিনি সশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। ইসলামী দর্শনে এমন একটি গাঁজাখুরি মতবাদের প্রশয় লাভ ঘটেছে প্রারম্ভিককালে ইসলামে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের অন্ধ-কুবিশ্বাস থেকে। এ ব্যাপারে আমার যীশু সম্পর্কিত গবেষণামূলক (“যীশু শুয়ে আছেন ভারতে”) গ্রন্থটি এখনও প্রকাশিতব্য- অনুলেখক।) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও রয়েছে।

তরবারির যে অমানবিক রক্তপাতে ইসলাম প্রথম সমাজের অশিক্ষিত, দুর্বল, নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তারচেয়ে ও নির্দয় ও বীভৎস কায়দায় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়েছে ভন্ড পলের সৃষ্ট খ্রীষ্ট ধর্মের পান্ডারা। তাঁরা ক্রুশে মৃত্যু না হওয়ার পর আতঙ্কজনক, পলায়মান যীশুর কাল্পনিক গল্প প্রচার করে, জোর-জবরদস্তি আইন করে, তৎকালীন সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের সমাজে একঘরে করে, তাঁদের বইপত্র, পান্ডুলিপি পুড়িয়ে, যীশুর ‘হোলি স্প্রীট’ এর ভুয়া ধূঁয়া তুলে ‘খ্রীষ্টধর্মের দর্শন’ প্রতিষ্ঠা করেছে।

এর প্রায় ছয়শ বছর পর একই কায়দায় ইসলামের আবির্ভাব। অত্যন্ত ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু এই ধর্ম হলো তরুণতম বিশ্বজনীন ধর্ম। অন্য দুটি বিশ্বজনীন ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম প্রকৃতিতে অনেক কম সর্বজনীন।

যুগের পর যুগ ধরে এই ধর্ম মূল সীমেটিক (শমেতেচি) এবং এমনকি আরবীয় চরিত্র পালন করে এসেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার মতো স্বচ্ছতা, প্রসারতা এই ধর্মের নেই। ইসলাম অত্যন্ত গোঁড়া ধর্ম। স্থিতিশীল ধর্ম। আরবীয় স্টাইলের বাইরে এর কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো রকম পরিবর্তন এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। এমন কি আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি গুলিও অপরিবর্তনযোগ্য। নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের যে সুযোগ খ্রীষ্টধর্মে রয়েছে, ইসলামে তা নেই।

কোরানের একটি জের-জবর-নজ্জাও ইসলাম পরিবর্তনের অনুমোদন করে না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানেরা আজ যে কোরানকে একেবারে অপরিবর্তিত ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে, প্রথম দিকে, গ্রন্থনকালে এর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা ওসমানের সময় কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ পান্ডুলিপিগুলো তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় কোরানের সাত প্রকারের সংস্করণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। এগুলো ছিলো প্রথম দুটি মদীনায়, তৃতীয়টি মক্কায়, চতুর্থটি কুফা নগরে, পঞ্চমটি বসরায়, ষষ্ঠটি সিরিয়ায় এবং সপ্তমটি এমন কদর্য ছিলো যে, সেটাকে সামান্য সংস্করণ হিসেবে লিপিকারগণ সেটির স্থানের নামই উল্লেখ করেন নি। সেই সাতটি লিপিবদ্ধ কোরানে এমন অনেক বিষয়াদি ছিলো ‘যা পাঠে মানুষ বিপথগামী হইবে’ এই বিবেচনায় সেগুলোকে পুড়িয়ে নষ্ট করে নতুনভাবে সংকলিত করা হয় ‘ঐশীগ্রন্থ’ নামক আজকের কোরানকে। এরকম রক্ষা কথা শুনে অনেক মুসলমানই অতৃপ্ত হতে পারেন, কিন্তু পারেন না ঐতিহাসিক সত্যকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে। গোঁড়া ইসলামপন্থীরা এতোই অসহিষ্ণু ও ধর্মাত্মক যে এরা সুস্থিরভাবে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারকেই বিবেচনায় নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, অথচ নিজেরা ইসলামী বিধি-বিধান, নিয়মকানুন একজনও সঠিক, সুষ্ঠুভাবে পালন করে না, কিন্তু নিজেদেরকে ‘মুসলমান’ বলে আত্মপরিচয় দিতে তৃপ্তি বোধ করে।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পরের বছরই ওমরের পরামর্শে প্রথম খলিফা আবু বকর কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য জনৈক যাকে ইবনে সাবেতকে প্রধান করে ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। এ ব্যাপারে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন তাঁর অনূদিত কোরানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন,

....‘জয়দ নামক জনৈক মদীনাবাসী পণ্ডিত ঐশ্বাহের অস্থিত এই অংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খজুর-পত্র দ্বিখিত, শেত প্রস্তরে খোদিত এবং মানুষের বক্ষে চিত্রিত আয়াত অক্ষর অংগ্রহ করেন। এই অংগ্রহীত বচন অক্ষর প্রথমত আমীর আবু বকরের নিকট ছিল, পরে তাঁহার মৃত্যুকালে হফ্‌সা নম্মী হযরতের পত্নীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রন্থকেই মান্য করিয়া চানিয়া ছিলেন। তাঁরা মৃত্যুর পর আমীর ওসমানের সময়ে নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অমস্ত পরস্পর এতৌ বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোমদমান মন্ডলীর মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে ওসমান পুনরায় সেই জয়াদের দ্বারা কোরান অংগ্রহ করিয়া তাহাই অমস্ত মুমদমানকে মান্য

করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নূতন গ্রন্থের বহু খণ্ড প্রতিলিপি করাইয়া মমত্ব
প্রধান নগরে প্রেরণ পূর্বক পূর্বলিখিত মমত্ব কোরআন অঙ্গিতে দস্ত করাইয়া
ফেন্দেন’ (ডাই গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত ‘কোরআন শরীফ’ এর ২য়
সংস্করণের ভূমিকা, পৃ: ১১-১২, হরফ প্রকাশনী, কলমেজ স্ট্রীট, কলকাতা)।

এ বিষয়টি সম্প্রতি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মোহম্মদ মতিওর রহমানের ‘ঐতিহাসিক অভিধান’
গ্রন্থে উল্লেখিত আছে।

আবু বকর থেকে ওসমান পর্যন্ত কোরানের প্রথম পর্বে লিখিত সংস্করণগুলোর সময়কাল ছিল ১৯ বছর।
৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান আবু বকরের সময়কার যাকেদ কর্তৃক কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ সংস্করণগুলো
পুড়িয়ে ফেলেন। এবং পরবর্তিতে ওসমান সেই যাকেদ ইবনে সাবেতকেই আবার নতুন করে কোরানকে
লিপিবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গিরিশ চন্দ্র তাঁর
ভূমিকাতে ১২ পৃষ্ঠার টিকায় কোরান সংগ্রহকারী বলে ‘জয়দ’ নামের যার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি
তাকেই মোহম্মদের মৃত্যুর ক্রীতদাস-পরে ধর্মপুত্র যাকেদ বিবেচনা করেছেন, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ
মোহম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর আগে তাঁর ধর্মপুত্র যাকেদ সিরিয়ার সন্নিহিত রোমান-শাসক শোহারাবিলের
সৈন্যদের হাতে নিহত হন, এবং যাকেদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী জয়নবকে মোহম্মদ বিবাহ করেন।
অতএব কোরান লিপিবদ্ধ কাজে নেতৃত্বদানকারী যাকেদ এবং মোহম্মদের ধর্মপুত্র যাকেদ কিভাবে অভিন্ন
ব্যক্তি হন?

ইসলাম ধর্মে আরবের মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য
আলোচিত ধর্মমতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে বিশেষ কোনো অভিনবত্ব দেখা যায় না।
ইসলাম ধর্ম হলো জুডাবাদের (ইহুদীদের) বিশেষ কয়েকটি দিক, এবং অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্মের (খ্রীষ্টানদের)
কিছু ভ্রান্ত জ্ঞানের সংমিশ্রণ। খ্রীষ্ট ধর্মের ঈশ্বরের ধারণার থেকে ইসলামের ধারণা যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলাম
ধর্মেই বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রগতি যে অধিকতর হয়েছে এটিকে প্রতিপন্ন করার জন্যে জ্ঞান অপেক্ষা,
বল ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়েছে বেশি। *আজ থেকে প্রায় ছয়শত বছর আগে ইবন বতুতা তাঁর
‘রেহলা’ গ্রন্থে লিখেছেন,*

‘যে দিন থেকে আরবরা তুমোয়ার হাতে নিষেছে, সে দিন থেকেই অন্য
জাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করেছে।’

এই ধর্মের আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অতিবর্তী। একজন প্রাচ্য দেশীয় এক নায়ককে খুব বড় করে দেখলে যেমন
হয় ইসলাম ধর্মের আল্লাহ তেমনি স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এবং স্বৈরশাসকরূপী প্রভু। কথায় কথায়
চোখ রাঙানো হচ্ছে তাঁর বড় কাজ। তিনি স্বর্গের সুলতান। কিন্তু তাঁকে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না,
অথচ মানুষ তাঁর দান, একান্তরূপে তাঁর সম্পত্তি! এবং বিশ্বের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত! ইসলামের
আল্লাহর গুণের মধ্যে কোনো প্রেম বা পবিত্রতার স্থান নেই, আছে কেবল ধমক আর হুমকি, সঙ্গে পরকাল
বিষয়ক ইন্দ্রিয় সুখ-ভাগের লোভনীয় ইঙ্গিত। আগাগোড়াই ইসলাম প্রগতি-পরিপন্থী।

[২য় পর্ব...](#)